

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল (১৯৮৬-১৯৯৫) একটি পর্যালোচনা

ড. মো. রুহুল আমিন *

Abstract: The Legislature is the bottom of heart of democracy. The importance of Legislature is more significant as a superior organization for establishing transparency and accountability in the state management. For the functioning of the Legislature constitutional law with political tradition of the member of Parliament, personal qualification, experienced, total political environment of the state, objectives of the functioning political parties, programme, devise and participation of the opposition political association/union in the Parliament which can doing intent role-are the discussing matter of this article.

ভূমিকা

আধুনিক যুগে আইনসভা হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। আইনসভা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন। আইনসভা দেশের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কেন্দ্র হিসেবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনসভার কার্যাবলী নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) বলেন, “The Legislative authority forms the major Premises; the Judiciary the minor ; and the Executive, the conclusion... As the major Premise in more important than the minor and conclusion, so the Legislature is more important than the Executive or Judiciary.”^১ অধ্যাপক গার্নার (Garner) যথার্থই বলেন “of all the organs of Government the Legislature undoubtedly occupies the paramount Place.”^২ Peter Pyne বলেন, “উন্নয়নশীল দেশসমূহে আইনসভা সিদ্ধান্তমূলক (Decisional) এবং বৈধকরণমূলক (Legitimation) কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।”^৩

পৃথিবীর সব দেশের আইনসভার কাজ এক নয়। আইনসভার কাজ সম্পর্কে কোন সর্বজন স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। আসলে আধুনিক যুগে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম বলে আইনসভার কাজ ও ক্ষমতার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

তাত্ত্বিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনসভা নিজ নিজ সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করলেও বাস্তব ভিত্তিতে তার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সাংসদদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীসমূহের উদ্দেশ্য, কর্মসূচি,

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কৌশল এবং সংসদে বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্বের উপর। বাংলাদেশে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে, যার সাংবিধানিক নাম 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ'। এ প্রবন্ধে ১৯৮৬-১৯৯৫ সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি এবং সে সাথে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকৌশল ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং উক্ত সময়ে সংসদের কার্যকলাপের উপর সাংসদদের প্রভাব কতটুকু ছিল তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

এ প্রবন্ধ মূলত একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। এখানে ১৯৮৬-১৯৯৫ সময়ে বাংলাদেশ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টে সাংসদদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীসমূহের উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কৌশল এবং সংসদে বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা মূল্যায়নের চেষ্টা করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এ গবেষণা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিল-পত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে— গেজেট বিবরণী, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, সংসদ সদস্যদের জীবনবৃত্তান্ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র, প্রকাশিত ঘোষণাপত্র, নির্বাচনী ইস্তেহার, সংবাদ-বিবৃতি, প্রচারপত্র, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

১. সংসদে দলীয় অবস্থান

(ক) তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬

গণভোট ও উপজেলা নির্বাচনের সাফল্য জেনারেল এরশাদকে 'বেসামরিকীকরণ' প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে উৎসাহিত করলে ২ মার্চ, ১৯৮৬ তিনি ঘোষণা করেন যে, ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে তিনি জাতীয় পার্টি নামে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন।^৪ বিরোধী জোট ও দলসমূহ সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি অব্যাহত রেখে ২২ মার্চ (মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন) দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলে ২১ মার্চ, ১৯৮৬ সন্ধ্যায় জেনারেল এরশাদ বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে বিরোধী দলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, আজ রাতের মধ্যে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দিলে নির্বাচনের তারিখ ও তফসীল পুনর্বিবেচনা করা হবে, নতুবা ২২ মার্চে বিরোধী দলগুলোর সকল কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হবে এবং পূর্বঘোষিত ২৬ এপ্রিল তারিখেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।^৫ আওয়ামী লীগসহ ১৫-দলীয় জোটের প্রধান অংশ ও জামায়াতে ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেও ৭-দলীয় জোট ও ১৫-দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি ছোট বামপন্থী দল (যারা পরবর্তীতে এক পৃথক ৫-দলীয় জোট গঠন করে) উক্ত নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে (বিরোধী দলগুলোর) মনোনয়ন পত্র

দাখিলের শেষ তারিখ বর্ধিত করে পূর্বঘোষিত ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে, ১৯৮৬ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হয়।^৬ নির্বাচনে মোট অংশগ্রহণকারী ২৮টি দলের (৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ) ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।^৭

সারণি-১*

সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ৭ মে, ১৯৮৬

দল	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৫১.০০	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৫.৩৩	২৬.১৬
জামায়াতে ইসলাম	৭৬	১০	৩.৩৩	৪.৬১
ন্যাপ (এক্য)	১০	৫	১.৬৬	১.২৯
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	১.৬৬	০.৯১
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	১.৩৩	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৩৩	১.৪৫
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	১.০০	০.৮৭
বাকশাল	৬	৩	১.০০	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	৩	১.০০	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	১০	২	০.৬৬	০.৭১
অন্যান্য দল	২৪	-	-	১.৭৩
নির্দলীয় প্রার্থী	৪৫৩	৩২	১০.৬৬	১৬.১৯

সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি-১৫৩ টি, আওয়ামী লীগ-৭৬, জামায়াতে ইসলামী-১০, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-৫, ন্যাপ (এক্য)-৫, জাসদ (রব)-৪, মুসলিম লীগ-৪, জাসদ (সিরাজ)-৩, বাকশাল-৩, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি-৩, ন্যাপ (মোজাফফর)-২, নির্দলীয় প্রার্থী- ৩২টি আসন লাভ করে।

তবে এ নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে জনমনে প্রচুর সন্দেহ থেকে যায়। দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ করেন এবং এজন্য প্রধানত সরকারি দলকেই দায়ী করা হয়।^৮

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এ নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বললে খুব কম বলা হবে, জাতীয় পার্টি ‘ভোট ডাকাতি’ করেছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এ নির্বাচন ছিল ‘মিডিয়া কু’ সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার টেলিভিশনে বানোয়াট ফলাফল প্রচারের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় অনেক প্রার্থীকে পরাজিত ঘোষণা করে জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।^৯

(খ) চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

প্রধান বিরোধী দলসমূহ এরশাদ সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এরশাদের আদ্যোগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে ৮-দল, ৭-দল ও ৫-দল আন্দোলন অব্যাহত রেখে ১০ নভেম্বর, ১৯৮৭ ‘ঢাকা অবরোধ’ কর্মসূচি গ্রহণ করলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে।

এ অবস্থায় জেনারেল এরশাদ ২৭ নভেম্বর, ১৯৮৭ সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রেখে ৬ ডিসেম্বর তারিখে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ৩ মার্চ, ১৯৮৮ তারিখে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে প্রধান বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।^{১১} তবে নির্বাচনে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কেবল জাসদের দু'টি উপদল জাসদ (রব) ও জাসদ (সিরাজ) অংশ গ্রহণ করলেও নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক ভোটার ভোটদান করেন এবং সরকারও ব্যাপক কারচুপি়র আশ্রয় গ্রহণ করে।

সারণি-২^{১২}

সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ৩ মার্চ, ১৯৮৮

দল	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৯৯	২৫১	৮৩.৬৬	৬৮.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৯	১৯	৬.৩৩	১২.৬৩
জাসদ (সিরাজ)	২৫	০৩	১.০০	১.২০
ফ্রিডম পার্টি	১১২	০২	০.৬৬	৩.২৯
২৩-দলীয় জোট	৩৩	-	-	০.৪০
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৩	-	-	০.৪১
জন দল	১২	-	-	০.১১
গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি	১	-	-	০.০২
নির্দলীয় প্রার্থী	২১৪	২৫	৮.৩৩	১৩.৫০

সংসদে ৩০০ টি সাধারণ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি-২৫১ টি, সম্মিলিত বিরোধী দল-১৯, জাসদ (সিরাজ)-৩, ফ্রিডম পার্টি-২, এবং নির্দলীয় প্রার্থী-২৫ টি আসন লাভ করে।

প্রধান বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচন বর্জন করলে নির্বাচন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতা ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনকে 'প্রতারণা' বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের আহবানে সাধারণ ভোটারগণ এ নির্বাচন বর্জন করে।^{১৩}

(গ) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ এক সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ঐ দিনই তিন জোটের যৌথ রূপরেখা অনুযায়ী এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং নিজে পদত্যাগ করে শাহাবুদ্দিনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।^{১৪} জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে যাবার ৯০ দিনের মধ্যে (সাংবিধানিক বিধান অনুসারে) নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক বিধায় উক্ত বিধান মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।^{১৫} এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৫ টি দলের মধ্যে ৬৩ টি দল সংসদে একটি আসনও পায়নি।

সারণি-৩^{১৬}
সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

দল	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট/শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৪০	৪৬.৬৬	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	২৯.৩৩	৩০.০৮
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৬৬	১১.৯২
জামায়াতে ইসলাম	২২২	১৮	৬.০০	১২.১৩
বাকশাল	৬৮	৫	১.৬৬	১.৮১
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৯	৫	১.৬৬	১.১৯
ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	১	০.৩৩	০.৭৯
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৩১	১	০.৩৩	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৩৩	০.৪৫
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	১	০.৩৩	০.৩৬
জাসদ (সিরাজ)	৩১	১	০.৩৩	০.২৫
ওয়ার্কাস পার্টি	৩৫	১	০.৩৩	০.১৯
নির্দলীয়	৪২৪	৩	১.০০	৪.৩৯

সংসদে ৩০০ টি সাধারণ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-১৪০ টি, আওয়ামী লীগ-৮৮, জাতীয় পার্টি-৩৫, জামায়াতে ইসলামী-১৮, বাকশাল-৫, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি-৫, ইসলামী ঐক্যজোট, ন্যাপ, গণতন্ত্রী দল, জাসদ (সিরাজ), ওয়ার্কাস পার্টি ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি করে এবং নির্দলীয়-৩টি আসন লাভ করে। ৭৫ টি অংশগ্রহণকারী দলের ৬৩টি দল সংসদে ১টি আসনও পায়নি। ২৬ টি দল সর্বমোট এক হাজারেরও কম ভোট পায় এবং একটি দলের প্রাপ্ত মোট ভোটের সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ২৫।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ নির্বাচন ছিল সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সর্বজন স্বীকৃত। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান ও সার্কভুক্ত দেশগুলো হতে আগত পর্যবেক্ষকগণ এ নির্বাচনকে অনন্য, অত্যন্ত সফল ও চমৎকার বলে বর্ণনা করেন।^{১৭}

২. সাংসদদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি

(ক) সাংসদদের শিক্ষার মান

বাংলাদেশের তৃতীয় পার্লামেন্টে (১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন) নির্বাচিত ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৭৫ (২২.৭২%) জন পোস্ট-গ্রাজুয়েট, ১১৬ (৩৫.১৫%) জন গ্রাজুয়েট, ১৯ (৫.৭৫%) উচ্চ মাধ্যমিক, ১৩ (৩.৯৩%) জন মাধ্যমিক, ৩ (০.৯০%) জন মাধ্যমিকের নিচে এবং ২ (০.৬০%) জন ছিলেন মাদ্রাসা ডিগ্রীধারী। উক্ত সংসদে নির্বাচিত ১০২ (৩০.৯০%) জন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-৪^{১৮}

সাংসদদের শিাগত মান (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের তুলনামূলক চিত্র)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	তৃতীয় পার্লামেন্ট	চতুর্থ পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
পোস্ট গ্রাজুয়েট	৭৫ (২২.৭২%)	৬৩ (১৯.০৯%)	১০৬ (৩২.১২%)
গ্রাজুয়েট	১১৬ (৩৫.১৫%)	৮০ (২৪.২৪%)	১৬২ (৪৯.০৯%)
উচ্চ মাধ্যমিক	১৯ (৫.৭৫%)	২২ (৬.৬৬%)	৩২ (৯.৬৯%)
মাধ্যমিক	১৩ (৩.৯৩%)	১২ (৩.৬৩%)	১১ (৩.৩৩%)
মাধ্যমিকের নিচে	৩ (০.৯০%)	৫ (১.৫১%)	৪ (১.২১%)
মাদ্রাসা	২ (০.৬০%)	-	১০ (৩.০৩%)
অন্যান্য	-	-	-
অজানা	১০২ (৩০.৯০%)	১৪৮ (৪৪.৮৪%)	৫ (১.৫১%)

চতুর্থ পার্লামেন্টে (১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন) নির্বাচিত ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৬৩ (১৯.০৯%) জন পোস্ট-গ্রাজুয়েট, ৮০ (২৪.২৪%) জন গ্রাজুয়েট, ২২ (৬.৬৬%) জন উচ্চ মাধ্যমিক, ১২ (৩.৬৩%) জন মাধ্যমিক, ৫ (১.৫১%) জন মাধ্যমিকের নিচে এবং অবশিষ্ট ১৪৮ (৪৪.৮৪%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম পার্লামেন্টে (১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন) নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১০৬ (৩২.১২%) জন পোস্ট-গ্রাজুয়েট, ১৬২ (৪৯.০৯%) জন গ্রাজুয়েট, ৩২ (৯.৬৯%) জন উচ্চ মাধ্যমিক, ১১ (৩.৩৩%) জন মাধ্যমিক, ৪ (১.২১%) জন মাধ্যমিকের নিচে এবং ১০ (৩.০৩%) জন মাদ্রাসা ডিগ্রীধারী। তবে উক্ত সংসদে নির্বাচিত ৫ (১.৫১%) জন সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি পার্লামেন্টেই সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোস্ট-গ্রাজুয়েট, গ্রাজুয়েট ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

(খ) সাংসদদের পেশা

যে কোন পার্লামেন্টে বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থ-গোষ্ঠীর লোকেরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে নিজ নিজ গ্রুপের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকে সংসদকে প্রাণবন্ত ও প্রভাবিত করতে পারেন। এ লক্ষ্যে তাঁদের পেশা, গোষ্ঠী ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা অতীব জরুরি।

১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্ট নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থ-গোষ্ঠীর লোক নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩১ (৯.৩৯%) জন আইনজীবী, ৯১ (২৭.৫৭%) জন ব্যবসায়ী, ৩১ (৯.৩৯%) জন কৃষিজীবী, ২৬ (৭.৮৭%) জন শিক্ষক, ৬ (১.৮১%) জন চিকিৎসক, ৬ (১.৮১%) জন সাংবাদিক, ১ (০.৩০%) জন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, ৬

৪ (১.২১%) জন জোতদার, ২ (০.৬০%) জন গৃহস্থালী, ৯ (২.৭২%) জন অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। নির্বাচিত অবশিষ্ট ১০১ (৩০.৬০%) জন সদস্যের পেশা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-৫^{১১}

সাংসদদের পেশাগত অবস্থান (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের তুলনামূলক চিত্র)

সদস্যদের পেশা	তৃতীয় পার্লামেন্ট	চতুর্থ পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
আইনজীবী	৩১(৯.৩৯%)	৩০(৯.০৯%)	৪৬(১৩.৯৩%)
ব্যবসায়ী	৯১(২৭.৫৭%)	৮৭(২৬.৩৬%)	২৮(৮.৪৮%)
কৃষিজীবী	৩১(৯.৩৯%)	১৯(৫.৭৫%)	৪(১.২১%)
শিক্ষক	২৬(৭.৮৭%)	৮(২.৪২%)	৩৭(১১.২১%)
চিকিৎসক	৬(১.৮১%)	৩(০.৯০%)	৮(২.৪২%)
সাংবাদিক	৬(১.৮১%)	৮(২.৪২%)	৪(১.২১%)
ট্রেড ইউনিয়নিস্ট	১(০.৩০%)	১(০.৩০%)	-
সমাজসেবক	৬(১.৮১%)	২(০.৬০%)	১৫২(৪৬.০৬%)
চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)	-	২(০.৬০%)	২৯(৮.৭৮%)
ইঞ্জিনিয়ার	৩(০.৯০%)	-	৩(০.৯০%)
শিল্পপতি	১৩(৩.৯৩%)	৫(১.৫১%)	১০(৩.০৩%)
জোতদার	৪(১.২১%)	৪(১.২১%)	-
লেখক	-	-	২(০.৬০%)
গৃহস্থালী (মহিলা সদস্য)	২(০.৬০%)	-	-
অন্যান্য	৯(২.৭২%)	৮(২.৪২%)	১(০.৩০%)
অজানা	১০১(৩০.৬০%)	১৫৩(৪৬.৩৬%)	৬(১.৮১%)

চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩০ (৯.০৯%) জন আইনজীবী, ৮৭ (২৬.৩৬%) জন ব্যবসায়ী, ১৯ (৫.৭৫%) জন কৃষিজীবী, ৮ (২.৪২%) জন শিক্ষক, ৩ (০.৯০%) জন চিকিৎসক, ৮ (২.৪২%) জন সাংবাদিক, ১ (০.৩০%) জন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, ২ (০.৬০%) জন সমাজসেবক, ২ (০.৬০%) জন চাকুরীজীবী (অবসরপ্রাপ্ত), ৫ (১.৫১%) জন শিল্পপতি, ৪ (১.২১%) জন জোতদার এবং ৮ (২.৪২%) জন অন্যান্য পেশার সদস্য ছিলেন। তবে উক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত অবশিষ্ট ১৫৩ জন সদস্যের পেশা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৬ (১৩.৯৩%) জন আইনজীবী, ২৮ (৮.৪৮%) জন ব্যবসায়ী, ৪ (১.২১%) জন কৃষিজীবী, ৩৭ (১১.২১%) জন শিক্ষক, ৮ (২.৪২%) জন চিকিৎসক, ৪ (১.২১%) জন সাংবাদিক, ১৫২ (৪৬.০৬%) জন সমাজসেবক, ২৯ (৮.৭৮%) জন চাকুরীজীবী (অবসরপ্রাপ্ত), ৩ (০.৯০%) জন ইঞ্জিনিয়ার, ১০ (৩.০৩%) জন শিল্পপতি, ২ (০.৬০%) জন লেখক এবং ১ (০.৩০%) জন অন্য পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ৬ (১.৮১%) জন সদস্যের পেশা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের পেশার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আইনজীবী পেশায় নিয়োজিত তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে সংখ্যার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও পঞ্চম পার্লামেন্টের আইনজীবী

পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের সঙ্গে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সমাজসেবক, চাকুরে (অবসর প্রাপ্ত) এসব পেশার সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও অন্যান্য পেশার সদস্যদের মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

(গ) সাংসদদের বয়স

১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৫ (১.৫১%) জন ২৫-৩০, ৯৫ (২৮.৭৮%) জন ৩১-৪০, ৭৪ (২২.৪২%) জন ৪১-৫০, ৪৫ (১৩.৬৩%) জন ৫১-৬০, ৮ (২.৪২%) জন ৬১-৭০ বয়স-গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং ৫ (১.৫১%) জন সদস্য ৭১-উর্ধ্ব বয়সের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশিষ্ট ৯৮ (২৯.৬৯%) জন সদস্যের বয়সের কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি।

সারণি-৬^{৩০}

সাংসদদের বয়স

(তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের তুলনামূলক চিত্র)

সদস্যদের বয়স	তৃতীয় পার্লামেন্ট	চতুর্থ পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
২৫-৩০	৫ (১.৫১%)	৪ (১.২১%)	৪ (১.২১%)
৩১-৪০	৯৫ (২৮.৭৮%)	৭২ (২১.৮১%)	৬৫ (১৯.৬৯%)
৪১-৫০	৭৪ (২২.৪২%)	৬৮ (২০.৬০%)	১৩২ (৪০%)
৫১-৬০	৪৫ (১৩.৬৩%)	২৩ (৬.৯৬%)	৮৬ (২৬.০৬%)
৬১-৭০	৮ (২.৪২%)	৭ (২.১২%)	৩৪ (১০.৩০%)
৭১-উর্ধ্ব	৫ (১.৫১%)	-	২ (০.৬০%)
অজানা	৯৮ (২৯.৬৯%)	১৫৬ (৪৭.২৭%)	৭ (২.১২%)

চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৪ (১.২১%) জন ২৫-৩০, ৭২ (২১.৮১%) জন ৩১-৪০, ৬৮ (২০.৬০%) জন ৪১-৫০, ২৩ (৬.৯৬%) জন ৫১-৬০, ৭ (২.১২%) জন ৬১-৭০ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং অবশিষ্ট ১৫৬ (৪৭.২৭%) জন সদস্যের বয়সের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৪ (১.২১%) জন ২৫-৩০, ৬৫ (১৯.৬৯%) জন ৩১-৪০, ১৩২ (৪০%) জন ৪১-৫০, ৮৬ (২৬.০৬%) জন ৫১-৬০ এবং ৩৪ (১০.৩০%) জন ৬১-৭০ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২ (০.৬০%) জনের ৭১-উর্ধ্ব বয়স ছিল। এবং ৭ (২.১২%) জনের বয়সের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের বয়সের তুলনামূলক চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায়, ২৫-৩০ বয়সের গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও ৩১-৪০, ৪১-৫০, ৫১-৬০, ৬১-৭০ বয়সের গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় তাদের মধ্যে মহান অস্বীকার বোধের উদ্ভব হয় এবং তারা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হলে তাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পার্লামেন্টের কার্যকলাপ পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৩৩ (১০%) জন ১৯৬৫ সালের পূর্বে, ৫২ (১৫.৭৫%) জন ১৯৬৫-১৯৭০, ৩০ (৯.০৯%) জন ১৯৭১-১৯৭৫, ১৬ (৪.৮৪%) জন ১৯৭৬-১৯৭৯, ৪৬ (১৩.৯৩%) জন ১৯৮০-১৯৮৫, ৪ (১.২১%) জন ১৯৮৬-১৯৮৭ এর মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সংসদে নির্বাচিত অবশিষ্ট ১৪৯ (৪৫.১৫%) জনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময় সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-৭^২

সাংসদদের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের তুলনামূলক চিত্র)

সদস্যদের বয়স	তৃতীয় পার্লামেন্ট	চতুর্থ পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
১৯৬৫ সালের পূর্বে	৩৩(১০%)	৩০(৯.০৯%)	১৩৭(৪১.৫১%)
১৯৬৫-১৯৭০	৫২(১৫.৭৫%)	৩৫(১০.৬০%)	৯০(২৭.২৭%)
১৯৭১-১৯৭৫	৩০(৯.০৯%)	৩৫(১০.৬০%)	১১(৩.৩৩%)
১৯৭৬-১৯৭৯	১৬(৪.৮৪%)	১৮(৫.৪৫%)	৫৪(১৬.৩৬%)
১৯৮০-১৯৮৫	৪৬(১৩.৯৩%)	১৮(৫.৪৫%)	১২(৩.৬৩%)
১৯৮৬-১৯৮৭	৪(১.২১%)	-	-
১৯৮৮-১৯৯০	-	৬(১.৮১%)	-
১৯৮৬-১৯৯০	-	-	১৬(৪.৮৪%)
১৯৯১-১৯৯৫	-	-	৩(০.৯০%)
অন্যান্য (স্বতন্ত্র)	-	-	১(০.৩০%)
অজানা	১৪৯(৪৫.১৫%)	১৮৮(৫৬.৯৬%)	৬(১.৮১%)

চতুর্থ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩০ (৯.০৯%) জন ১৯৬৫ সালের পূর্বে, ৩৫ (১০.৬০%) জন ১৯৬৫-১৯৭০, ৩৫ (১০.৬০%) জন ১৯৭১-১৯৭৫, ১৮ (৫.৪৫%) জন ১৯৭৬-১৯৭৯, ১৮ (৫.৪৫%) জন ১৯৮০-১৯৮৫ এবং ৬ (১.৮১%) জন ১৯৮৮-১৯৯০ এর মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সংসদে নির্বাচিত অবশিষ্ট ১৮৮ (৫৬.৯৬%) জনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময় সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম সংসদ সদস্যদের ১৩৭ (৪১.৫১%) জন ১৯৬৫ সালের পূর্বে, ৯০ (২৭.২৭%) জন ১৯৬৫-১৯৭০, ১১ (৩.৩৩%) জন ১৯৭১-১৯৭৫, ৫৪ (১৬.৩৬%) জন ১৯৭৬-১৯৭৯, ১২ (৩.৬৩%) জন ১৯৮০-১৯৮৫, ১৬ (৪.৮৪%) জন ১৯৮৬-১৯৯০, ৩ (০.৯০%) জন ১৯৯১-১৯৯৫ এর মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১ (০.৩০%) জন স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সংসদের ৬ (১.৮১%) জনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময় সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের যে সকল সদস্য ১৯৬৫ সালের পূর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৬৫-১৯৭০, ১৯৭১-১৯৭৫ এর মধ্যে যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৬-১৯৭৯ এর মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(ঙ) পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সাংসদদের অভিজ্ঞতা

প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানরা সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারণি-৮^{২২}

পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সাংসদদের অভিজ্ঞতা (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের তুলনামূলক চিত্র)

সদস্যদের বয়স	তৃতীয় পার্লামেন্ট	চতুর্থ পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
স্নায়	১৭২(৫২.১২%)	১১৫(৩৪.৮৪%)	২১৯(৬৬.৩৬%)
৫ বছর	৫৬(১৬.৯৬%)	৬৪(১৯.৩৯%)	৯৮(২৯.৬৯%)
১০ বছর	৬(১.৮১%)	২(০.৬০%)	৯(২.৭২%)
১৫ বছর	-	-	-
২০ বছর	-	-	-
২৫ বছর	-	-	-
অজানা	৯৬(২৯.০৯%)	১৪৯(৪৫.১৫%)	৪(১.২১%)

বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের ১৭২ (৫২.১২%) জন সদস্যের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ৫৬ (১৬.৯৬%) জনের ৫ বছর এবং মাত্র ৬ (১.৮১%) জনের ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। অবশিষ্ট ৯৬ (২৯.০৯%) জন সদস্যের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে অভিজ্ঞতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১১৫ (৩৪.৮৪%) জনের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে কোন অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। ৬৪ (১৯.৩৯%) জনের ৫ বছরের এবং ২ (০.৬০%) জনের ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১৪৯ (৪৫.১৫%) জনের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে অভিজ্ঞতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২১৯ (৬৬.৩৬%) জনের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ৯৮ (২৯.৬৯%) জন ৫ বছর এবং ৯ (২.৭২%) জন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। অবশিষ্ট ৪ (১.২১%) জনের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে অভিজ্ঞতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তিনটি পার্লামেন্টের সদস্যদের রাজনৈতিক অতীতের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রতিটি পর্যায়েই তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের সদস্যদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন।

৩. রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকৌশল

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার প্রতি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীসমূহের অঙ্গীকারের উপর। নিম্নে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের শাসনামলে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি, কর্ম-কৌশল এবং ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

(ক) জাতীয় পার্টি

২৪ মার্চ, ১৯৮২ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত বি.এন.পি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে^{২৩} সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেন। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকার নিমিত্তে এবং বিরোধী দলকে মোকাবেলার লক্ষ্যে এরশাদ রাজনৈতিক দলগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার উপর থেকে বিধি নিষেধ তুলে নেয়া হয়।^{২৪} এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এরশাদ নভেম্বর, ১৯৮৩ তাঁর মনোনীত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘জনদল’ নামে একটি সরকার সমর্থক দল গঠনের ব্যবস্থা করেন।^{২৫} জনদলে যোগদানকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগ (মিজান), বিএনপির একাংশ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্র্যাটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের), ইউ.পি.পি. (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ), মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী)^{২৬}। এ জোটভুক্ত দলগুলোকে একত্রিত করে ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ এরশাদ ‘জাতীয় পার্টি’ নামে একটি নতুন দল গঠন করেন^{২৭} এবং দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এরশাদ নিজেই। জাতীয় পার্টি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সমর্থক। দলটি পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের নীতিতে বিশ্বাসী এবং বিরাস্ত্রীয়করণ নীতিকে উৎসাহ প্রদান করে। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ‘জাতীয় পার্টি’ ৭মে, ১৯৮৬ অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৫৩ টি আসন দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে^{২৮} এবং ৩ মার্চ, ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদের মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫১ টি আসন লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু দলটি তাদের সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখে বিকল্প কর্মসূচি প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯০-এ এক সফল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে জাতীয় পার্টিও দেশের ক্ষমতার মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়। বহু কাজিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩৫ টি আসন লাভ করে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।^{২৯}

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ৩০ মুসলিম লীগ সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে মুসলিম লীগের প্রগতিবাদী অংশের কতিপয় নেতা ও কর্মী জুন, ১৯৪৯ ঢাকায় মিলিত হয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন, যার সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন। ৩১ অক্টোবর ১৯৫৫ আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অসাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্যে দলটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামে একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩২

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে শক্তিশালী পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবি অব্যাহত রাখে। মার্চ, ১৯৫৪ অনুষ্ঠিত পূর্ব-বাংলা আইন সভার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরীক দল হিসেবে জয়যুক্ত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে স্পষ্ট ম্যান্ডেট লাভ করে। ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেলে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন সভায় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের আসন লাভ করে এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতি সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৩৩

আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৫৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার পূর্ব বাংলায়ও ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সারা দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৩৪ ১৯৬২ সালে পুনরায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের সমন্বয়ে National Democratic Front গঠনের মাধ্যমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবিধানে গণতন্ত্রায়ণের আন্দোলন শুরু করেন। ৩৫ ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরুতের এক হোটেল কক্ষে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে ফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ৬-দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত ও অর্থনৈতিকভাবে হতাশাগ্রস্ত পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিমা শাসক চক্রের কবল থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৩৬

৭ ও ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্ধারিত ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনেই আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। ৩৭

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ না দেয়ার

প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যে গণ-আন্দোলনের শুরু হয় আওয়ামী লীগ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দলটি ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের সহযোগিতায় একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে সক্ষম হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের উপর ন্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র ১১ মাসের মধ্যে এক গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়। এই নতুন সংবিধানের অধীনে ৭ মার্চ, ১৯৭৩ যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আওয়ামী লীগ ৭৩% ভোট পেয়ে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে সরকার গঠনে সমর্থ হয়^{৮০}। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে^{৮১} আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। অপর দিকে কিছু সংখ্যক চরম বামপন্থি দল আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রাখার প্রেক্ষাপটে জানুয়ারি, ১৯৭৫ আওয়ামী লীগ সরকার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় ব্যবস্থা (বাকশাল) প্রবর্তন করে।^{৮২}

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাকশাল ভেঙ্গে দেয়া হয়^{৮৩} এবং ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দল বিধির অধীনে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দু'টি গ্রুপ আওয়ামী লীগ (মালেক) ও আওয়ামী লীগ (মিজান) যথাক্রমে ২৪.৫৬% ভোট ও ৩৯ টি আসন এবং ২.৭৮% ভোট ও দু'টি আসন লাভে সক্ষম হয়।^{৮৪}

দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে আপোষ ফর্মুলা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হলেও দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে।^{৮৫}

১৯৮৩ সালে গঠিত ১৫-দলীয় জোটের প্রধান দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে^{৮৬} মে, ১৯৮৬ অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৬.১৬% ভোট ও ৭৬ টি আসন লাভ করে সংসদে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে^{৮৭}। তবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ উত্থাপন করলেও সংসদে বসে এবং 'যুগপৎ সংসদের ভেতর ও বাইরে থেকে' সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০% ভোট ও ৮৮টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে।^{৮৮}

(গ) বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং)

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। সমগ্র ভারতে যে একটি মাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল (ভারত বিভক্তির পূর্বে) যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে

প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। তবে পার্টি সহিংস সামাজিক বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করলে পাকিস্তানের উভয় অংশে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালের পর হতে পূর্ব-বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি সহিংস সংগ্রামের পথ পরিহার করে সকল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ‘জনগণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। ১৯৫১-৫২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য জনপ্রিয় সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করার নীতি গ্রহণ করলে জুলাই, ১৯৫৪ পাকিস্তান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে দলের নেতা ও কর্মীগণ আত্মগোপন করে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত আত্মগোপনকারী দল হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে এর অস্তিত্ব বজায় রাখে।^{৪৭}

ষাটের দশকে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আদর্শগত বিরোধ দেখা দিলে এর প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। চীনপন্থী কমিউনিষ্ট কর্মীগণ ১৯৬৬ সালে মূল দল ত্যাগ করে কমরেড সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে একটি নতুন দল গঠন করে। অপরদিকে কমরেড মনি সিং-এর নেতৃত্বে আদি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত পন্থাকে বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী বলে মনে করে। বর্তমানে এটিই বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং) নামে পরিচিত^{৪৮}। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি রাজশাহী জেল হতে পালিয়ে বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।^{৪৯}

এই দল সহিংস বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাস করে না এবং সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত মূলনীতিতে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এ দল আগ্রহী^{৫০}। “বন্দুকের নল হতে ক্ষমতা আসে না, ইহা আসে মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্য হতে”- এই ধারণায় বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাসী। নির্বাচনী প্রচারণা ও সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের এই চেতনা জাগ্রত করা যেতে পারে। একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্ত।^{৫১}

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং) ৪টি আসনে প্রার্থী মনোনীত করলেও কোন আসন লাভে সক্ষম হয়নি। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ দলটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ‘ত্রিদলীয় ঐক্যজোট’ এবং ১৯৭৫ সালে বাকশালে যোগদান করে।

১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দল বিধির অধীনে কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং) পুনরুজ্জীবিত হয়ে ‘১০ দলীয় ঐক্য জোটের’ অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জিয়া বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন আসনেই জয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৮৩ সালে জে. এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের শরিক দল হিসেবে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি ৫টি আসন

লাভ করে। এ দল সংসদে সপ্তম সংশোধনী বিলের চরম বিরোধিতা করে এবং ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দলটি ৫টি আসন লাভ করে^{৫৩}। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট বিপর্যয়ের পর দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এর বৃহত্তম অংশ ডঃ কামাল হোসেনের ‘গণ ফোরামে’ যোগদান করে।^{৫৪}

(ঘ) জাসদ (সিরাজ)

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ১৫-দলীয় জোটের শরীক দল হিসেবে জাসদের একটি অংশ জাসদ (সিরাজ) জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি কেন্দ্র করে দলের মধ্যে যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় তাতে শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে একটি অংশ ১৫-দলীয় জোটের একাংশের সঙ্গে (আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিসহ) সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।^{৫৫}

৭ মে, ১৯৮৬ অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাসদ (সিরাজ) ১৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ০.৮৭% ভোট ও ৩টি আসন লাভে সক্ষম হয়^{৫৬}। এ নির্বাচনে সংসদীয় প্রার্থী বন্টনকে কেন্দ্র করে ১৫-দলীয় জোটের শরীক দলগুলোর মধ্যে জাসদ (সিরাজ) ও আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনের পর জাসদ (সিরাজ) ১৫-দলীয় জোট ত্যাগ করে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে সপ্তম সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিলেও দলটি জেনারেল এরশাদকে প্রকাশ্যে সমর্থনদানে বিরত থাকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩১ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ০.২৫% ভোট ও ১ টি আসন লাভে সক্ষম হয়।^{৫৭}

(ঙ) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কতিপয় আদেশ^{৫৮} জারির মাধ্যমে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)’ নামে একটি একক ‘জাতীয়’ রাজনৈতিক দল গঠন করেন^{৫৯}। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করেন এবং তা পরিচালনা করার সকল ক্ষমতাও তাঁর থাকে^{৬০}। ‘বাকশাল’ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে এবং সকল দলের সদস্যদের জন্য বাকশালে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি এ দলের (বাকশাল) সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। জাতীয় ঐক্য ও ‘শোষিতের গণতন্ত্র’ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বাকশালের ঘোষিত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাকশাল সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। আগষ্ট, ১৯৭৫ সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বাকশাল সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে এবং সেসঙ্গে অন্যান্য দলের সঙ্গে বাকশালকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করা হয়।^{৬১}

রাজনৈতিক দল বিধির অধীনে (১৯৭৬) আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি পৃথক পৃথক সংগঠন হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়। আওয়ামী লীগ অক্টোবর, ১৯৮৩ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত বামপন্থি একটি গ্রুপ দল হতে বের হয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাককে যথাক্রমে পুনর্গঠিত বাকশালের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ৬২

১৫-দলীয় জোটের অন্যতম অঙ্গদল হিসেবে বাকশাল জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তবে ৭ মে, ১৯৮৬ অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে এ দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সরদার আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে দলের একটি অংশ ৮ দলের সঙ্গে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ০.৬৭% ভোট ও ৩টি আসন লাভ করে। তবে মহিউদ্দিন-রাজ্জাকের নেতৃত্বে দলের মূল অংশটি ১৯৮৬ সালের সংসদ বা রাষ্ট্রপতি কোন নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করেনি। এটি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের শরিক দল হিসেবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাকশাল ৬৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১.৮১% ভোট ও ৫টি আসন লাভে সক্ষম হয়। নির্বাচনের পর আগস্ট, ১৯৯১ বাকশাল বিলুপ্ত করে এর নেতাগণ আবার আওয়ামী লীগে একীভূত হয়ে যায়। ৬৩

(চ) বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

১৯৭৮ সালে ইউ.পি.পি-র একটি অংশ আবুল হালিম চৌধুরী ও কাজী জাফর আহম্মদের নেতৃত্বে জেনারেল জিয়ার জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগদান করে ৬৪। এ প্রেক্ষাপটে জনাব নজরুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন প্রমুখের নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। নভেম্বর, ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত লেলিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে দলের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি' নামকরণ করা হয় এবং এ সম্মেলনেই 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামক সম্মুখ সংগঠনটি বিলুপ্ত করে 'বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি' নামেই প্রকাশ্য রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামেই দলটি ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ০.১৭% ভোট ও ১টি আসন লাভ করে ৬৫। ১৯৮৩-৮৪ সালে দলে উপ-দলীয় কোন্দল দেখা দেয়ার প্রেক্ষাপটে জুলাই, ১৯৮৪ নজরুল ইসলাম হায়দার-আকবর খান রনোকে অপসারণ করে পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই, ১৯৮৫ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি রনো-মেননের নেতৃত্বে মজদুর পার্টির (আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন) সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি নামেই একটি পৃথক সংগঠনের জন্ম দিলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ৫-দলীয় জোটের অঙ্গ দল হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৫ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ০.১৯% ভোট ও ১টি আসন লাভ করে। ৬৬

(ছ) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আগষ্ট, ১৯৪১ মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে ধর্মভিত্তিক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে অথও ইসলামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করলেও ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে সহসাই মেনে নিয়ে ১৯৪৮ সালে জামায়াত 'কোরান ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র' প্রণয়নের দাবিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়।^{৬৭}

উপমহাদেশ বিভক্তির পর জামায়াত পাকিস্তান ও ভারতে পৃথকভাবে কাজ শুরু করে। মাওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয় এবং অধ্যাপক গোলাম আজম ১৯৫৬ সালে জামায়াতের প্রাদেশিক সম্পাদক নিযুক্ত হন।^{৬৮}

১৯৬৫ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে আইয়ুব বিরোধী ভূমিকা, ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শাস্তি কমিটি এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালনসহ অসংখ্য প্রগতিশীল বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীকে হত্যার সমস্ত নীলনক্সা প্রস্তুত করে।^{৬৯}

স্বাধীনতার পর অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কণ্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করে বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতের কাজ চলতে থাকে।^{৭০}

কোরান-সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণই জামায়াতের লক্ষ্য। জামায়াত শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। সেই পরিবর্তন কোরান ও সুন্নাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শের অনুযায়ী হবে।^{৭১}

১৯৭৭ সালের গণভোট ও ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াকে সমর্থন, ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সান্তারকে সমর্থন, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।^{৭২}

(জ) জাসদ (রব)

২৪ মার্চ, ১৯৮২ জেনারেল এরশাদ সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসন বিরোধী দু'টি ঐক্যজোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫-দলীয় জোটের মধ্যে জাসদ ছিল অন্যতম^{৭৩}। কিন্তু এরশাদকে সমর্থনের প্রশ্নে অল্প দিনের মধ্যে দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দলের একটি অংশ

আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে এরশাদ সরকারকে সমর্থনের নীতি গ্রহণ করে এবং এপ্রিল, ১৯৮৪ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামেই পৃথকভাবে সংগঠিত হয়, যা জাসদ (রব) নামে পরিচিতি লাভ করে। এ দল জেনারেল এরশাদের শাসনামলে প্রবর্তিত সকল কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।^{৭৪}

জাসদ (রব) ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২.৫৪% ভোট ও ৪টি আসন লাভে সক্ষম হয়। এই দলটি সংসদে জাতীয় পার্টি কর্তৃক আনীত সপ্তম সংশোধনী বিলের পক্ষে ভোট প্রদান এবং ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও জেনারেল এরশাদকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান করে। এমন কি সংসদীয় ঐতিহ্য ভঙ্গ করে আ.স.ম. আবদুর রব সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন^{৭৫}। এ দল 'অনুগত বিরোধী দল' হিসেবে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করার প্রেক্ষাপটে জেনারেল এরশাদ এ দলের একজন সদস্যকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের পতন ঘটলে এ দল (জাসদ রব) নিক্রিয় হয়ে পড়ে। জাসদ (রব) ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৬১ টি আসনে প্রার্থী মনোনীত করেও কোন আসনে জয়ী হতে পারেনি।^{৭৬}

(ঝ) বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর মুসলমান জনগণ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করে^{৭৭}। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের শাসনামলেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মাটি থেকে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে যায়।^{৭৮}

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর রাজনৈতিক শক্তির বাহন হিসেবে মুসলিম লীগকে বেছে নিয়ে একে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নাম দিয়ে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে খাজা নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' নামে পুনর্গঠিত হয়। আইয়ুবের পতনের পর কনভেনশন মুসলিম লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। এভাবে মুসলিম লীগের তিনটি উপদল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পৃথকভাবে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি, কনভেনশন মুসলিম লীগ ২টি এবং কাইউম মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের কোন আসনেও তারা জয়ী হতে পারেনি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা করার দায়ে মুসলিম লীগের ৩টি উপদলকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে ধর্মভিত্তিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।^{৭৯}

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জিয়া সরকার সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ডানপন্থী ইসলামী দলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ দেয়া হলে তিন মুসলিম লীগের সমন্বয়ে (১৯৭৬ সালের দল বিধির অধীনে) 'বাংলাদেশ মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করা হয়।^{৮০}

সংবিধানের ইসলামী সংশোধনী এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাবের কারণেই ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে ইসলামী দলগুলো জিয়াকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। ১৯৭৮ সালে গঠিত জিয়ার জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগদানকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি অংশ শাহ আজিজের নেতৃত্বে প্রথমে যুক্তফ্রন্ট ও পরে বিএনপিতে যোগদান করে। অপর অংশ সবুর খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব বজায় থাকে।^{৮১}

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০% ভোট ও ২০টি (যার মধ্যে ১৪টি মুসলিম লীগ) আসন লাভে সক্ষম হয়। নির্বাচিত মুসলিম লীগের উক্ত সদস্যগণ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করে।^{৮২}

১৯৮০ সাল থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে যে নেতৃত্বের কোন্দল ও ভাঙ্গন শুরু হয় তা পর পর পাঁচটি উপদলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালে বি.এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন উপদলটি জেনারেল এরশাদের জাতীয় ফ্রন্টে যোগদান করে এবং পরে এটি এরশাদের নবগঠিত জাতীয় পার্টিতে একীভূত হয়ে ক্ষমতার অংশীদার হয়। ১৯৮৬ সালে কাজী আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের উপদলসমূহ পুনরায় একত্রিত হয়ে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১০৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১.৪৫% ভোট ও ৪টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়।^{৮৩} ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ - মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন) এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ) নামে ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোন আসন লাভেই সক্ষম হয়নি।^{৮৪}

(ঞ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতি, আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতি এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে দ্বিধাবিভক্ত করে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। পরবর্তীতে এ দল ন্যাপ (মোজাফফর) বা 'মস্কোপন্থী ন্যাপ' নামে পরিচিতি অর্জন করে।^{৮৫}

ন্যাপ (মোজাফফর) ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের' অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ১০৭ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩.২% ভোট ও ১টি আসনে জয় লাভ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ (মোজাফফর) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় দলীয় প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ 'বিপ্লবী মুজিব নগর সরকারের' উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{৮৬}

ন্যাপ (মোজাফফর) সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়^{৮৭}। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ন্যাপ, আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি 'ত্রি দলীয় ঐক্য জোট' গঠন, ১৯৭৫ সালে বাকশালে যোগদান করে। ১৯৭৭ সালের 'গণভোটে' ন্যাপ অংশগ্রহণ করে জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি 'ধর্ম-কর্ম সমাজতন্ত্র' নামক কর্মসূচি ঘোষণা করলে দলের মধ্যে যে বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি হয়, এ বিরোধকে কেন্দ্র করেই সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ন্যাপের (মোজাফফর) একটি অংশ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 'জাতীয় একতা পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করে। জুলাই, ১৯৭৯ চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ ও পংকজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে (অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সাথে মৈত্রীর মিল না হওয়ায়) একটি পৃথক 'ন্যাপ' গঠিত হয়। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও ন্যাপ (হারুন-পঙ্কজ) যৌথভাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে প্রার্থী মনোনীত করে।^{৮৮}

১৯৮১ সালে এরশাদ বিরোধী যে ১৫-দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় তাতে জাতীয় একতা পার্টি, ন্যাপ (হারুন-পংকজ), ন্যাপ (মোজাফফর) যোগদান করে সহ-অবস্থান ও সামরিক শাসন বিরোধী ৭ দফা আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে ন্যাপের বিভিন্ন অংশের নেতাদের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠে। ফলে জানুয়ারি, ১৯৮৬ এ তিন দলের ঐক্য সম্মেলনে 'এন.এ.পি.' নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়। ৭ মে, ১৯৮৬ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'এন.এ.পি.' ১.৬৬% ভোট ও ৫টি আসন এবং ন্যাপ (মোজাফফর) ০.৬৬% ভোট ও ২টি আসন লাভ করে।^{৮৯}

(চ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা হয়^{৯০}। ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ সিপাহী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এপ্রিল, ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথমে গণভোট এবং পরে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন।^{৯১}

রাজনৈতিক সমর্থন ভিত্তি গঠনের অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে জিয়া তাঁর নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি দল গঠন করেন। কিন্তু জাগদল প্রভাবালী রাজনীতিকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মে, ১৯৭৮ জাগদলের সঙ্গে ন্যাপ (ভাষানী), মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ), ইউপিপি (কাজী জাফর), লেবার পার্টি ও তফশীল জাতি ফেডারেশন (নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের একটি ক্ষুদ্র সংগঠন) একত্রিত করে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে একটি জোট গঠন করেন এবং এ জোটের প্রার্থী হিসেবে জুন, ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন^{৯২}। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জিয়া যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একটি নিজস্ব দল গঠন করেন।^{৯৩}

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠন এবং সে সঙ্গে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কথাও স্বীকার করে। দলটি অর্থনৈতিক মুক্তি ও প্রগতি অর্জন,

অর্থনৈতিক স্বয়ংস্ভরতা অর্জন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নব্য উপনিবেশিকতাবাদ ও সর্ব প্রকার আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করে।^{৯৪}

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিয়ার বিএনপি ৪১% ভোট পেয়ে ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২০৭ টি আসন লাভ করে^{৯৫}। বিএনপি বিভিন্ন দল, মত ও আদর্শের অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্র সংগঠন। ফলে তিনি (জিয়া) তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করেও ব্যর্থতার পরিচয় দেন^{৯৬}। অপর দিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এক দারুন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টির এমনি এক সময় ৩০ মে, ১৯৮১ জিয়া এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিহত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন^{৯৭}। পরবর্তীতে বিচারপতি সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ২৪ মার্চ, ১৯৮২ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানে বিচারপতি সাত্তার তথা বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়।^{৯৮}

সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ ১৯৮৩ সালে ১৫-দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে। বিএনপিও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ডানপন্থী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৭ দলীয় জোট গঠন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে^{৯৯}। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে^{১০০}। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে ডিসেম্বর, ১৯৯০ গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ তিন জোটের যৌথ রূপ-রেখার আলোকে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর পর গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৩০.৮১% ভোট ও ১৪০ টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।^{১০১}

৪. প্রধান দলসমূহের রাজনৈতিক অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক

দেখা যাচ্ছে যে, লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আওয়ামী লীগ (মিজান), বি.এন.পির একাংশ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের), ইউ.পি.পি. (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ), মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) নিয়ে জাতীয় পার্টি গঠন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও বিকেন্দ্রীয়করণ নীতি উৎসাহিত করলেও বিরোধী জোট ও দলসমূহ তার এই নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সংসদ নির্বাচনের দাবি অব্যাহত রাখে। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫-দলীয় জোটের বৃহত্তর অংশ ও জামায়াতে ইসলামী এরশাদের আহবানে সাড়া দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ৭-দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮-দল, ৭-দল ও ৫-দল এরশাদকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ না করে নির্বাচন বর্জনসহ সরকারের বৈধতা অস্বীকার করে। তবে পরিচিত দলগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জাসদের দু'টি উপ-দল জাসদ (রব) ও জাসদ (সিরাজ) এরশাদ সরকারকে সমর্থন প্রদান করে।

বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং) সামরিক শাসন-বিরোধী ১৫-দলীয় ঐক্যজোটের শরিক দল হিসেবে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এরশাদকে সমর্থন প্রদান করলেও সপ্তম সংশোধনীর বিরোধিতা করে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে এবং গণঅভ্যুত্থানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৫টি আসন লাভ করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট বিপর্যয়ের পর দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণ ফোরামে যোগদান করে।

দেখা গেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৫-দলীয় জোটের প্রধান দল হিসেবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করলেও নির্বাচনে কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ করে সংসদে বসে সংসদের ভিতরে-বাইরে যুগপৎ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংসদে একটি বিল জমা দিয়ে সংসদে ১৩তম অধিবেশন চলাকালে সংসদ থেকে ওয়াক আউটের পথ ধরে মাগুরা নির্বাচনের উত্তেজনায় সংসদ বর্জন করে।

১৫-দলীয় জোটের অঙ্গ দল হিসেবে বাকশাল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সরদার আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে দলের একটি অংশ উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। দলটি ১৯৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৫টি আসন লাভ করে এবং নির্বাচনের পর বাকশাল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে একীভূত হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে বি.এন.পি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে সংসদ বর্জনে সামিল হয়।

সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে ১৫-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল হওয়া সত্ত্বেও জাসদ (রব) এরশাদের শাসনামলে প্রবর্তিত সকল কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৪টি আসন লাভ করে। সপ্তম সংশোধনীর বিলের পক্ষে ভোট প্রদানসহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এরশাদকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করলেও এরশাদ সরকারের পতনের পর জাসদ (রব) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের উপদলসমূহ সামরিক সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে একত্রিত হয়ে তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৪টি আসন লাভে সক্ষম হয় এবং চতুর্থ সংসদ নির্বাচন বর্জনসহ গণ-অভ্যুত্থানে সামিল হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন) এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ) নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোন আসন লাভে সক্ষম হয়নি।

জাসদ (সিরাজ) তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় প্রার্থী বন্টনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে ১৫-দলীয় জোট ত্যাগ করে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে এবং সপ্তম সংসোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করলেও জেনারেল এরশাদকে প্রকাশ্য সমর্থনদানে বিরত থাকে। ১৯৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১টি আসন লাভে সক্ষম হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুকে কেন্দ্র করে বি.এন.পি.র শাসনামলে সংসদ বর্জন করে।

কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ডানপন্থি দলের (ইউ.পি.পি., গণতান্ত্রিক পার্টি ও কমিউনিষ্ট লীগের মত বামপন্থি ও জাতীয় লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মত ডান ইসলামী পন্থি দল) সঙ্গে একীভূত হয়ে ৭-দলীয় জোট গঠন করে বি.এন.পি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। তৃতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন বর্জন করে এরশাদের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অব্যাহত রেখে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পদত্যাগের সমস্ত নীলনকশা প্রস্তুত করে এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরকার গঠনে সমর্থ হয়। সংসদ চলাকালে বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে বি.এন.পি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়।

সি.পি.বি. ১৫-দলীয় জোটের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জোটের মধ্যে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা তাতে বিপ-বী আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম অগ্রসর করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে জাসদ (একাংশ), বাসদের দু'উপ-দল, ওয়ার্কার্স পার্টি (একাংশ) ও শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল সংসদীয় রাজনীতিতে পূর্ণ আস্থাশীল না থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কারণ দলগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন ও ছোট সূত্রাং তারা নির্বাচনে না গিয়ে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ নিজ সংগঠনকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়।

লক্ষণীয় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের সময়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যারা বিভিন্ন ঐক্যজোট গঠন করে তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশলে এরশাদকে সমর্থন প্রদান করলেও তা টিকে থাকেনি, কারণ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও স্বার্থলোভী ব্যক্তিরাই উক্ত কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলেও দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদ সরকারকে কোনভাবেই বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি. ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলো সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে সংসদকে অকার্যকর করে তোলে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এরশাদের শাসনামলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং তারা

সংসদের বৈধতা অস্বীকার করে। এরশাদের শাসনামলে সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। বিশেষ করে চতুর্থ সংসদে বৃহৎ বিরোধী দলসমূহের অনুপস্থিতির ফলে সংসদ কোন দিনই বৈধতা অর্জন করতে পারেনি। সংসদে তথাকথিত বিরোধী দলের কোন কার্যকর ভূমিকা ছিল না বরং তা 'গৃহপালিত বিরোধী দল' হিসেবে আখ্যায়িত হয়। সংসদ সরকারের নীতি বা কর্মসূচিকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। খুব কম সংখ্যক বিল সংসদে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয় এবং অধিকাংশ বিল বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়। সুতরাং তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে গণ্য করা যায় না। অপরদিকে তৃতীয় বা চতুর্থ সংসদ অপেক্ষাই শুধু নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অতীতের সকল সংসদ থেকে পঞ্চম সংসদ যথেষ্ট কার্যকর ছিল।

সুতরাং সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, তৃতীয় বা চতুর্থ সংসদ অপেক্ষা পঞ্চম সংসদ যথেষ্ট কার্যকর থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কোন সংসদই তার আশানুরূপ সফলতা দেখাতে পারেনি। সেক্ষেত্রে সাংসদদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি-সাংসদদের শিক্ষার মান, পেশা, বয়স, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সাংসদদের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মশৈলী, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলোর পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়।

কমিটি-অব্যবস্থাপনা

সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম সহায়ক উপায় ও পদ্ধতি হল সংসদীয় কমিটিসমূহ এবং তাদের কর্ম-তৎপরতার উপর জোর দেয়া। কমিটিসমূহের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিল, মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপের উপর সংসদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের সংসদ এখনও কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি। কমিটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে, যেমন - কমিটি গঠনে বিলম্ব, কমিটি গঠিত হলেও কমিটির সদস্যপদ ও সভাপতি নিয়ে জটিলতা, স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বদলে অন্য একজন এম.পিকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত হলেও বিরোধী দলকে কোন কমিটির সভাপতির পদ না দেয়া, কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব, রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপিত হলেও সেই রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করা, কমিটিগুলোকে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত জনশক্তি ও ভৌত সুবিধা না দেয়া ইত্যাদি। ফলে অনেক কমিটির পক্ষে বিশেষ করে তদারকি সম্পর্কিত কাজ করা সম্ভব হয়নি। সরকারও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

সংসদ সচিবালয়ের স্বাধীনতা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বাধীন সংসদ সচিবালয় অধিকতর প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে কোন দলীয় সরকারই এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেনি।

দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাংসদের অভাব

বাংলাদেশের সংসদগুলোতে কিছু অভিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিবান সদস্য এলেও অনেক নতুন সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও সংসদীয় রাজনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগানো হয় না। দক্ষ ও যোগ্য সাংসদ হওয়া একটি দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের বিষয়। বাংলাদেশের তরুণ সদস্যদের অনেকের মধ্যে দ্রুত ও কম পরিশ্রমে সংসদীয় রাজনীতি তথা রাজনৈতিক জীবনে সাফল্য লাভের প্রবণতা যেমন বিদ্যমান তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে তাদের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রশিক্ষিত করে তোলার চেষ্টাও অনুপস্থিত। তরুণ ও নবাগত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলার কোন চেষ্টা দল ও সংসদ সচিবালয় কোন পক্ষ থেকেই নেয়া হয়নি। অতীতে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের পরিবর্তে কালো টাকার মালিক, পেশী-শক্তির প্রভাব অর্থাৎ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে তাত্ক্ষণিক দলীয় ও উপ-দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ার কারণে যোগ্য, আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবান ব্যক্তিদের দলীয় মনোনয়নদান, নির্বাচিত করে নিয়ে আসা এবং উপযুক্ত সংসদীয় নেতৃত্ব দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও চিন্তা লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সংসদীয় রাজনীতির মান ও প্রভাব কমে এসেছে।

রাষ্ট্রপতি ও স্পিকারের নিরপেক্ষতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও স্পিকারের পদটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এগুলোকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এমন পদে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচনের পর তিনি দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবেন এই থাকে সাধারণের প্রত্যাশা। তাই ক্ষমতাশীন দল বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেবে এটাই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। কিন্তু বাংলাদেশে এই ঐতিহ্য রক্ষিত হয়নি। স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি পদ-দুটিও ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি।

সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের প্রয়োগ

প্রাণবন্ত বিতর্ক ও আলোচনা সকল সংসদেরই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদে এরূপ পরিবেশ বিরল। সংসদের সকল সদস্যই দল নির্ধারিত ও দলীয় নেতা-নেত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সংসদে বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। সংসদের নিকট তাঁদের বিবেক ও চিন্তা অনুযায়ী উপযুক্ত বক্তব্য মানুষ আশা করলেও কার্যত সদস্যরা দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অতিরিক্ত দল প্রীতির কারণে সংসদ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সৃষ্টিশীল সংসদীয় ভাষণ ও বিতর্ক থেকে বঞ্চিত হয়। দলের নীতি মানার বাইরে না যাওয়ার পেছনে একটি প্রধান কারণ সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ। এই বিধান থাকার ফলে সংসদ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে সরকার সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যা গণতন্ত্রের বিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা

গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। দলীয় সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার সুষ্ঠু পরিবেশ কোন দিনই পায়নি। তাই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার প্রত্যয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে নিরপেক্ষতার আবরণে আবৃত করতে হবে।

গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মারাত্মক অভাব দেখা যায় সরকারি গণমাধ্যম পরিচালনার ক্ষেত্রে। অতীতের কোন সরকারই সরকারি গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মত উদারতার পরিচয় দিতে পারেনি।

রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বাস্তবায়নহীনতা

গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও তার ঐতিহ্যের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা ও অঙ্গীকার থাকা যেমন প্রয়োজন; তেমনি প্রয়োজন সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিকাশ। কিন্তু বাংলাদেশে এই পরিবেশ কোন দিনই পরিলক্ষিত হয়নি।

সরকার ও বিরোধী উভয়পক্ষের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও অসহিষ্ণু মনোভাব

সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত দল সংসদ পরিচালনায় তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ হবে। বাংলাদেশে নির্বাচিত সকল সংসদে বিরোধী দলকে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ না দেয়ার অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়। সরকারি দলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন থাকলেও সরকারি দল বিরোধী দলের প্রতি যে যথেষ্ট সহনশীলতা ও উদারতা দেখায়নি এটাও সত্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকারি দল সময় ও সুযোগের অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধা নিলেও চূড়ান্ত অর্থে বিরোধী দলের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সংসদে প্রায়শই বিরোধী দলের অসহিষ্ণু আচরণ পরিলক্ষিত হয় - ঘন ঘন ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন, সংসদ থেকে পদত্যাগ ইত্যাদির ফলে বিরোধী দল তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভ করলেও সংসদ বিরোধী দলের সক্রিয় ও প্রাণবন্ত সংসদীয় আচরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম সংসদে বিরোধী দল ৭০ বার ওয়াক আউট করে। পঞ্চম সংসদের ৪০০ টি কার্য দিবসের মধ্যে ১১৮ দিন বিরোধী দল বিহীন সংসদ চলেছে। বিরোধী দল বিহীন সংসদের পূর্ণ মেয়াদ যেমন সরকারি দলকে বিব্রত করেছে, তেমনি বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সংসদের পূর্ণ মেয়াদপূর্তি বিরোধী দলকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। এভাবে সরকারি-বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার কথা বলা হলেও

বিগত সরকারগুলো নির্বাচনে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও নির্বাচনের পর কোন সরকারই তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। বরং বিচার বিভাগের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপসহ (প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতি ও সরকারের ইচ্ছানুযায়ী, অধস্তন আদালতগুলো সম্পূর্ণভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে, নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের কথা থাকলেও তা মানা হয়নি, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবস্থা আরও করুণ। ফলে বিচার বিভাগ তার যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যাবলীকে সুসংহত করে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য প্রয়োজন দলের মধ্যে ব্যাপক গণতন্ত্র চর্চা, সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের মধ্যে সহিষ্ণু ও সহর্মিতার মনোভাব, আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি, সং ও যোগ্য নেতৃত্ব, আইনের অনুশাসন, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ইত্যাদি কাঠামোর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া।

সূত্র নির্দেশিকা ও টীকা

- ^১ A. C. Kapur, Principles of Political Science, New Delhi, 1993, p. 479.
- ^২ J. W. Garner, Political Science and Government, Calcutta, 1951, p. 539.
- ^৩ Dr. Aminur Rahman, Bangladesh Parliament : Its working 1973-1982, Unpublished Ph. D. thesis, Rajshahi University, Rajshahi. 1996. p. 5.
- ^৪ Al Masud Hassanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics: An Assessment (Unpublished Ph.D. Thesis), Dhaka University, Dhaka, 1995, P. 156; Muhammad A. Hakim, Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum, Dhaka, 1993, P.23.
- ^৫ Al Masud Hassanuzzaman, Op. cit., PP. 156-157; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৪; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-১৯৯২), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী, ১৯৯৪, পৃ. ৩১১-৩১৩।
- ^৬ In addition to 300 general Seats, There Were 30 reserved seats for women who were to be elected by 300 directly elected members; Muhammad A. Hakim, Op.cit., PP. 24-25; Al Masud Hassanuzzaman, Op. cit., P. 158.
- ^৭ Ibid., PP. 157.
- ^৮ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1986.
- ^৯ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা -, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি-, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; দৈনিক সংবাদ, ৮ মে; বিচিত্রা, ১৬ মে, ১৯৮৬।
- ^{১০} দৈনিক সংবাদ, ৮মে; বিচিত্রা, ১৬ মে, ১৯৮৬।
- ^{১১} ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ..., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।
- ^{১২} Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1988.
- ^{১৩} Al Masud Hassanuzzaman, Op.cit., P. 171.
- ^{১৪} Muhammad A. Hakim, Op. cit., PP. 31-34; Al Masud Hassanuzzaman, Op.cit., P. 180.
- ^{১৫} Al Masud Hassanuzzaman, Ibid., P. 189; Muhammad A. Hakim, Op. cit., P. 46.
- ^{১৬} Government of the Poeole's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1991.

- ১৭ দৈনিক সংবাদ, ১মার্চ, ১৯৯১; Al Masud Hassanuzzaman, Op. cit.
- ১৮ তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক জাতীয় সংসদে দাখিলকৃত জীবন বৃত্তান্ত থেকে; আহমাদ উল্লাহ (সম্পাদিত), পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য প্রামাণ্য গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯২; Khalada Habib, Bangladesh Elections, Parliament and the Cabinet 1970-1991, Dhaka, 1991.
- ১৯ ঐ ।
- ২০ ঐ ।
- ২১ ঐ ।
- ২২ ঐ ।
- ২৩ Muhammad A. Hakim, Op. cit., P. 11.
- ২৪ তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ৭৭ ।
- ২৫ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬১; Muhammad A. Hakim, Op.cit., P. 20.
- ২৬ তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭৭; আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৬১ ।
- ২৭ ঐ ।
- ২৮ Muhammad A. Hakim, Op.cit., P. 25; তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭৭ ।
- ২৯ Muhammad A. Hakim, Op.cit., P.55; মোঃ মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃঃ ৪৬১; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা- প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২১১ ।
- ৩০ কে. এম. শামসুল আলম, বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১৮ ।
- ৩১ Lawrence Ziring, Bangladesh From Mujib to Ershad-An Interpretive Study, Dhaka, 1992, P. 18; Rounaq Jahan, Pakistan Failure in National Integration, Dhaka, 1973, PP. 41-42.
- ৩২ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৮১ ।
- ৩৩ Dr. Aminur Rahman, "Bangladesh Parliament: Its Wroking 1973-1982" (Unpublished Ph. D. Thesis), Rajshahi University, Rajshahi, 1996, P. 117.
- ৩৪ Tariq Ali, Pakistan Military Rule or People's Power, Delhi, 1970, PP. 87-155; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত ।

- ৩৫ S.A. Akanda, "Was Parliamentary System of Government Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan During Martial Law, 1958-62;" The Journal of the institute of Bangladesh studies, vol.3, 1978, PP. 90-91; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা---, প্রাণ্ডক্ত।
- ৩৬ ঐ, পৃঃ ১৮২; S.M. Noor Mohammed, Op.cit., P.27.
- ৩৭ S.M. Noor Mohammed, Ibid., P. 27; Ataur Rahman Khan, India, Pakistan and Bangladesh, Dhaka, 1976, p. 64; The Pakistan observer, 20 January, 1970.
- ৩৮ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1973.
- ৩৯ S.M. Noor Mohammed, Op.cit., P. 132.
- ৪০ Ibid., P.132-141; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৮৩।
- ৪১ S.M. Noor Mohammed, Op.cit., P. 151.
- ৪২ Muhammad A. Hakim, Op.cit., Appendix-iv.
- ৪৩ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা --, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮৪।
- ৪৪ ঐ।
- ৪৫ Government of the people's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1986.
- ৪৬ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৮৪; Muhammad A. Hakim, Op.cit., pp. 27-28; Government of the People's Republic of Bangladesh, Press Information Department, A Background Paper on Bangladesh Fifth Parliament Election, Handout No. 429, 20 February, 1991, P. 25.
- ৪৭ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থাঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭৫-৮৭।
- ৪৮ ঐ।
- ৪৯ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০৮।
- ৫০ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭৫-৮৭।
- ৫১ ঐ; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪০৮।
- ৫২ মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৪২-৪৪৩।

- ৫৩ ঐ; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১০।
- ৫৪ ঐ।
- ৫৫ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৪।
- ৫৬ Government of the people's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1986.
- ৫৭ Government of the people's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1991.
- ৫৮ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫, পৃঃ ৬২১-৬২২।
- ৫৯ Kirit Bhaumik, "Transition to one Party System Smooth in Bangladesh", The Times of India, 11 March, 1975.
- ৬০ Kirit Bhaumik, "National Party is Supreme Bangladesh Mnolith", The Times of India, 17 June, 1975.
- ৬১ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৭-৩৮৮।
- ৬২ ঐ, পৃঃ ৩৮৮।
- ৬৩ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Elections, 1986; Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1991.
- ৬৪ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৪।
- ৬৫ ঐ; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৩; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫; Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1979.
- ৬৬ বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি, তৃতীয় কংগ্রেসঃ কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৮৫; Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1991.
- ৬৭ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩০; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫; তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯; হাসান মোহাম্মদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৭; Shamsul I. Khan, S. Aminul Islam & M. Imdadul Haque, Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh, Dhaka, 1996.
- ৬৮ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩০; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫; তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯; হাসান মোহাম্মদ,

- প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭; Shamsul I. Khan, S. Aminul Islam & M. Imdadul Haque, Op.cit.; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৩০; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৯৫ ।
- ৬৯ ঐ, পৃঃ ৪৩১ ।
- ৭০ হাসান মোহাম্মদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭ ।
- ৭১ তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮০ ।
- ৭২ Al Masud Hassanuzzaman, Op. cit., PP. 110-121, 137-139, 156-160, 184-192.
- ৭৩ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০ ।
- ৭৪ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৯৪ ।
- ৭৫ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংঘাত-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৩৪ ।
- ৭৬ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Elections, 1991.
- ৭৭ মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৩১ ।
- ৭৮ ঐ; S.M. Noor Mohammed, Op.cit., P. 15.
- ৭৯ মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৩২; আবুল ফজল হক, (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৫ ।
- ৮০ সংবিধান সংশোধন, পঞ্চম সংশোধন; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪২৮ ।
- ৮১ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ..., প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪২৬-৪৩০ ।
- ৮২ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1979.
- ৮৩ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1986.
- ৮৪ Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1991.
- ৮৫ মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৪৮ ।
- ৮৬ ঐ; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৯৪-৯৫, ১০৬-১১০; ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংঘাত-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৪-৫৩ ।
- ৮৭ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৭ ।
- ৮৮ মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৪৮-৪৪৯ ।

- ৮৯ ঐ; Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Election, 1986.
- ৯০ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি- , প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫২ ।
- ৯১ ডঃ আবুল ফজল হক , বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪২২-৪২৩ ।
- ৯২ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৬ ।
- ৯৩ ঐ ।
- ৯৪ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৯-১০; মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৫৯ ।
- ৯৫ আবুল ফজল হক (সম্পাদিত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি-, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৭; S.R. Chakravarty, Bangladesh: The Nineteen Seventy Nine Election, New Delhi, 1988, P. 73.
- ৯৬ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪২৫ ।
- ৯৭ দৈনিক সংবাদ, ১ জুন, ১৯৮১ ।
- ৯৮ Muhammad A. Hakim, Op. cit., P. 11.
- ৯৯ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪২৬ ।
- ১০০ ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি-, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩১১-৩১৮; Lawrence Ziring, Op. cit., P. 173-199.
- ১০১ Muhammad A. Hakim, Op. cit., PP. 1-41.